উপন্যাসের নায়ক যখন জীবনানন্দ

সুমিতা চক্রবর্তী

জীবনী ও আত্মজীবনী এক জাতের গদ্য-লিখন নয়। জীবনীমূলক উপন্যাস এবং আত্মজীবনী মূলক উপন্যাসও মূলগত ভাবেই পৃথক। এই পার্থক্যের মূল কারণটি হল লেখকের দৃষ্টিকোণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান। আত্মজীবনী এবং আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস — উভয় ক্ষেত্রেই লেখক অনুভব করেন নিজেকে এবং নিজেকেই তিনি তুলে ধরতে চান পাঠকদের সামনে। আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে নিজের সম্পর্কে তাঁর সত্য অনুভব এবং পাঠকদের সামনে যেভাবে তিনি নিজেকে তুলে ধরতে চান তা-ই ভাষায় ব্যক্ত হয়। সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে আন্তরিক সত্যান্বেষণের সঙ্গে অভিব্যক্তির সেতুবন্ধন ঘটেছে কি না তা এক বিতর্কের বিষয়, অন্ততপক্ষে বিচারের বিষয়।

আত্মজীবন নিয়ে লিখিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে পরিসর একটু আলাদা। উপন্যাসে কাল্পনিক ঘটনা-সংস্থানের ছাড়পত্র মেনে নেওয়া হয়েছে শিল্পের বিচারে। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের কাছ থেকে প্রত্যাশা একটিই — তা হল উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে লেখকের মানস-অভিজ্ঞতার আত্মিক সম্পর্ক থাকবে। কেবল নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের চরিত্রের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হয় না। জীবনের বাস্তব ঘটনার সমান্তরাল সাদৃশ্য উপন্যাসের চরিত্রটির জীবনযাপনে প্রতিফলিত করার চেয়ে স্রষ্টার অন্তরের গভীরতর স্তরগুলিকে উপন্যাসের চরিত্রটির মানসলোকে সঞ্চারিত করে দেবার ঐকান্তিকতার মধ্যেই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের মূল চারিত্র নিহিত থাকে। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হল স্রষ্টা-শিল্পীর আত্মোপলব্ধির সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রের অন্তর্মনের সমান্তরালতা স্থাপন করবার প্রয়াস। অবশ্যই সেই প্রয়াসের মধ্যে অকৃত্রিমতা আর কৃত্রিমতার সীমারেখা কোথায় মিশে যায় তা নির্ধারণ করা সহজ নয়।

জীবনীমূলক উপন্যাসের দাবি অন্যরকম। একজন ব্যক্তিকে আর একজন ব্যক্তি, যিনি প্রত্যাশিতভাবেই তাঁর অনুরাগী এবং নিজে একজন ভাষাশিল্পী, কীভাবে অনুভব করেছেন — তারই লিখিত বয়ান হল জীবনীমূলক উপন্যাস। সেজন্য জীবনীমূলক উপন্যাসে আমরা দুজন মানুষকে সর্বদাই অনুভব করি। যাঁকে নিয়ে লেখা হচ্ছে এবং যিনি লিখছেন — দুজনের কথাই মনে রাখতে হবে আমাদের।

জীবনীমূলক উপন্যাসের সংখ্যা বিশ্বসাহিত্যে বেশি নয়। তার কারণ, একজন ব্যক্তির জীবনকে উপন্যাসের চরিত্ররূপে গ্রহণ করতে গেলে অত্যন্ত সাবধানে সেই প্রয়াসে ব্রতী হতে হয়। উপন্যাসের চরিত্র যথাযথভাবে বাস্তবের চরিত্র হবেন না। উপন্যাসের আখ্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই চরিত্রকে এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেখানে বাস্তবের মানুষটিকেও চেনা যায়। আবার, উপন্যাসের চরিত্রের দাবিও মেটানো যায়। একজন মানুষকে আর একজন মানুষ একেবারে ভিতর থেকে কখনোই বুঝতে পারেন না; অথচ ঔপন্যাসিককে তুলে আনতে হবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের

ভিতর-মনের বিভিন্ন গলি ও সুড়ঙ্গ। যখন থেকে ফ্রয়েড-এর তত্ত্বের নির্যাসটি, অর্থাৎ অবদমিত মনের আকাঙ্ক্ষার সত্য স্বীকৃত হয়ে গেছে তখন থেকে জীবনীমূলক উপন্যাস রচনার কাজটি হয়ে গেছে কঠিনতর। জীবনীমূলক উপন্যাসের অবলম্বন ব্যক্তি-চরিত্রকে উপন্যাসের স্রষ্টা কোন্ দিক থেকে দেখছেন সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় জীবনীমূলক উপন্যাসের ক্ষেত্রে। সেজন্য জীবনীমূলক উপন্যাস, সেইসঙ্গে নাটক এবং চলচ্চিত্রেও সতর্ক থাকতে হয় শিল্প-স্রষ্টাকেও। কারণ তাঁর সৃষ্টি বহুজনের ভাবাবেগকে বহুভাবে আঘাত করতে পারে।

বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) যখন বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী নিয়ে নাটক লিখেছিলেন তখন বিতর্ক ওঠেনি। কারণ আমাদের সমাজে ও সাংস্কৃতিক জগতে যে প্রচলিত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে এই দুই ব্যক্তিত্বকে দেখা হয় তারই স্বীকৃতি আছে ওই দুটি নাটকে। কিন্তু ধরা যাক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি জীবনী-নাটক, তাহলে বোধহয় তিনি একমুখী শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে চরিত্রায়িত করতেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের *আনন্দবিদায়* প্রহসনটি থেকে সেই ইঙ্গিতই আমরা পেয়েছি।

জীবনীমূলক উপন্যাস লেখা এজন্যই কঠিন — একজন বিখ্যাত মানুষের যাপিত জীবনের ঘটনাগুলির সঙ্গেই তাঁর মনের গোপন স্তরগুলিকে ঔপন্যাসিক তুলে আনতে চান। যে স্তরে বৈধ ও অবৈধ কামনা, ঈর্ষা, ঘৃণা, ক্রোধ, বিষাদ, সবই থাকতে পারে প্রত্যাশিতভাবেই, কিন্তু সর্বসমক্ষে তাঁকে যদি ঔপন্যাসিক নিজের ভাবনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন — তা অনেকের কাছে কেবল আপত্তিকর নয়, হয়ে ওঠে বেদনাদায়ক। এইসব কারণে জীবনী-উপন্যাস লেখার সময় ঔপন্যাসিককে খুবই সাবধান থাকতে হয়। প্রাপ্ত তথ্য এবং নিজের ভাবনার মধ্যে সামঞ্জস্য আনা ছাড়াও ভাবতে হয় পাঠকের মনে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথাও। এজন্যই জীবনীমূলক উপন্যাসের সংখ্যা বিশ্বসাহিত্যেও বেশি নয়।

জীবনীমূলক উপন্যাসের প্রসঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যে আর্ভিং স্টোন (Irving Stone : 1903-1989)-এর নামই প্রথমে মনে পড়ে। অবশ্য তিনি ইংরেজ নন, আমেরিকান। চিত্রশিল্পে ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ্-কে নিয়ে রচিত তাঁর উপন্যাস *লাস্ট্-ফর-লাইফ* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। এই বইটিকেও বিশ্ববিখ্যাত বলা হয়। জীবনী-উপন্যাস লেখার ব্যাপারে আর্ভিং স্টোন ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। অনেকগুলি জীবনীও তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনী-উপন্যাস রূপে পরিচিত রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *সেলর অন হর্স ব্যাক* (১৯৩৮) — জ্যাক লন্ডন-এর জীবন-ভিত্তিক উপন্যাস। সেইসঙ্গে *দি অ্যাগনি অ্যান্ড দি এক্স্ট্যাসি* (১৯৬১) — মিকেল এঞ্জেলো-র জীবন; *দ্য প্যাশন্স্ অভ দ্য মাইন্ড* (১৯৭১) সিগমুন্ড ফ্রয়েড-এর জীবন *দি অরিজিন* (১৯৮০) চার্লস ডারউইন-এর জীবন এবং *ডেপ্থ্স্ অভ গ্লোরি* (১৯৮৫) ক্যামিল পিসারো-র জীবন নিয়েও উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। পাশাপাশি ইংরেজি কথাসাহিত্যে সমারসেট মম-এর লিখিত *দ্য মুন অ্যান্ড সিক্সপেনস* (১৯১৯) উপন্যাসটির কথাও মনে পড়বে। পল্ গগ্যাঁ-র জীবনের কিছু ঘটনা নিয়ে রচিত এই উপন্যাসটি জীবনী-উপন্যাসের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করে।

আমাদের যেটি কৌতূহলপ্রদ মনে হয়, তা হল মম এবং স্টোন দুজনেই জীবনী-উপন্যাস

লিখেছেন প্রধানত চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, মনস্তত্ত্ববিদ এবং জীববিজ্ঞানীকে নিয়ে। সাহিত্যিক জ্যাক লন্ডন-কে নিয়ে লেখা উপন্যাসটিই একমাত্র ব্যতিক্রম। বাংলা সাহিত্যেও এই ধারার উজ্জ্বল স্বাক্ষর সমরেশ বসু লিখিত রামকিংকর বেইজ-এর জীবনভিত্তিক উপন্যাস *দেখি নাই ফিরে* যেটি অকাল প্রয়াণের কারণে তিনি শেষ করে যেতে পারেননি।

বাংলা সাহিত্যে জীবনী-উপন্যাস রচিত হবার দৃষ্টান্ত কম। তার কারণ ভারতীয় মনে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সম্পর্কে স্পর্শকাতরতা খুবই বেশি। জীবনী রচনার সময় অবলম্বিত ব্যক্তিদের কেবলই শ্রদ্ধাযোগ্য দিকগুলিকেই তুলে ধরা হয়। পাশ্চাত্য দেশবাসী এ বিষয়ে বহুদিনই সংস্কারমুক্ত হয়েছেন। কিন্তু এদেশে, এমনকী কোনো কোনো মানুষের জীবনী রচনার সময়ও তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের প্রসঙ্গটি (যদি তা প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরেও হয়) অনুল্লিখিত রাখবার প্রবণতা আমাদের চোখে পড়েছে। বিবাহ-বহির্ভূত কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রসঙ্গ এদেশে খুব সাবধানে এড়িয়ে যাওয়া হয় জীবনী রচনার ক্ষেত্রে। মনে পড়ে, খুব বেশিদিনের ঘটনা নয়, যখন একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিবাহ, বিদেশিনী স্ত্রী এবং কন্যার সম্পর্কে তথ্য জনসমক্ষে এসেছিল তখন উত্তেজিত সুভাষ-ভক্তরা কাগজটি পুড়িয়ে এবং পত্রিকা-দপ্তরের সামনে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ জানিয়ে ছিলেন। যে-দেশের সাধারণ মানুষের মানসিকতা এমন, সেদেশে জীবনীমূলক উপন্যাস লেখা সহজ নয়। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং কাজী নজরুল ইসলামের মতো লেখক-ব্যক্তিত্ব — যাঁদের যথাযথ জীবনীও উপন্যাসের চেয়ে আকর্ষক বলে মনে হতে পারে তাঁদের নিয়ে উপন্যাস লেখার প্রয়াস লক্ষিত হয় না। বলা যেতে পারে, বিগত তিরিশ বছরে এই সংস্কার কিছুটা শিথিল হয়েছে এবং নিতান্ত সাম্প্রতিককালে অনেকটাই অপসৃত হয়েছে এই সংস্কার।

মধ্যযুগের দুই কবিকে নিয়ে দুটি উপন্যাস পেয়েছি আমরা। কবি ভারতচন্দ্রকে নিয়ে *অমাবস্যার গান* লিখেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মহাশ্বেতা দেবীর *ব্যাধখণ্ড* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কবি মুকুন্দ।

সম্পূর্ণ উপন্যাসটি জীবনীমূলক নয়, কিন্তু বিশিষ্ট একজন মানুষের জীবন উপন্যাসটির কেন্দ্রে অনেকটাই স্থাপিত — এরকম সৃষ্টির সাহস দেখিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *সেই সময়* উপন্যাসে। অবশ্য তার আগে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রমথনাথ বিশী রচিত *কেরী সাহেবের মুন্সী* উপন্যাসটির কথাও স্মরণ করতে হবে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার ঐতিহাসিক বাতাবরণ এবং রামরাম বসুর চরিত্র অবলম্বনে রচিত উপন্যাসটি জনপ্রিয় হয়েছিল। রামরাম বসুর চরিত্রটিকে ভালোই ফুটিয়েছিলেন লেখক। কোনো আপত্তি ওঠেনি। কারণ রামরাম বসুর সঙ্গে ভক্তি-ভাবাবেগ জড়িত নেই বাঙালির মনে। *সেই সময়*-ও সেই ধারারই অনুবর্তন — অনেকটা বিস্তৃতভাবে। কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনকেই অবলম্বন করেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যদিও তাঁর নাম ব্যবহার করেননি এবং উপন্যাসের নবীনকুমার চরিত্রটিকে কাল্পনিক চরিত্ররূপে গ্রহণ করবার অনুরোধ জানিয়েছেন পাঠকদের কাছে। এই উপন্যাসে কালীপ্রসন্ন সিংহের চরিত্রচিত্রণ নিয়ে কিছু প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নবীনকুমারকে পিতৃবন্ধুর ঔরসজাত সন্তান বলে দেখিয়েছেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পর্কে এই ইঙ্গিত ধরে নিয়ে অনেকেই প্রতিবাদ করেছিলেন এই ধরনের লেখার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেই কালের বিত্তবান সমাজের অভ্যন্তরীণ ব্যভিচারের চিত্র হিসেবে ঘটনাটিকে এনেছেন। যদিও সমকালের কোনো কোনো পত্রিকায় এমন ইঙ্গিত ছিল যে, কালীপ্রসন্ন নন্দলাল সিংহের ঔরসজাত পুত্র নন। কিন্তু তা ব্যক্তিগত কুৎসা রটনার প্রয়াসও হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও দুটি জীবনী-উপন্যাস লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — *প্রথম আলো* এবং *রাণু ও ভানু*। যে সময়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রয়াস সেই সময়ে বিখ্যাত মানুষদের জীবন সম্পর্কে অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতার বিষয়টি অনেকটাই শিথিল হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাদম্বরীর ভূমিকা নিয়ে যখন *কবি মানসী* নামের গবেষণাগ্রন্থ লিখেছিলেন জগদীশ ভট্টাচার্য তখন তাই নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু কাদম্বরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের মাধুর্য নিয়ে সমালোচনার তর্জনী তোলার অভ্যাস এখন আর নেই বললেই চলে। সেই সুযোগেই লিখিত হয়ে চলেছে এ বিষয়ে অনেক ধরনের লেখা যেগুলিতে সাহিত্য-মূল্যের চেয়ে জনপ্রিয় হবার প্রবণতা সন্ধান করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা দুটি তেমন নয়। *প্রথম আলো*-তে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করা হয়েছে বৃহত্তর ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে, উনিশ শতকের সামগ্রিক চালচিত্রে আরও অনেক প্রসঙ্গের মধ্যে। কিন্তু *রাণু ও ভানু*-তে বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে ওঠা রানুর প্রতি প্রৌঢ়ত্বের উপান্তে উপস্থিত রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ নিয়ে যে উপন্যাস লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেখানে কেবল মানুষ রবীন্দ্রনাথকেই চেনা যায়। রবীন্দ্র-মানসের অন্তরালবর্তী এই মানস-চিত্রের রূপায়ণ নিয়েও আপত্তি তুলেছেন অনেকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি লেখকের অসম্মানসূচক ইঙ্গিত অন্তত আমার চোখে পড়েনি। সত্য সম্ভাবনার সীমাও অতিক্রম করেনি উপন্যাসটি।

জীবনী-উপন্যাসের ধারায় বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত সাম্প্রতিক সংযোজন জীবনানন্দ দাশের জীবনী নিয়ে রচিত উপন্যাস। দুটি উপন্যাস আমাদের হাতে। প্রথমটি *নীল হাওয়ার সমুদ্রে*। লেখক প্রদীপ দাশশর্মা। প্রথম প্রকাশ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে। অন্য উপন্যাসটির নাম *সোনালি ডানার চিল*। লেখক সুরঞ্জন প্রামাণিক। প্রথম প্রকাশ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে। সেই সঙ্গেই প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছি কেতকী কুশারী ডাইসন এর *তিসিডোর* নামক উপন্যাসটির কথা। এই উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ ২০০৮-এ। এই উপন্যাসটিতে জীবনানন্দ দাশের *সফলতা নিষ্ফলতা* নামের একটি উপন্যাস অন্যতম প্রধান অবলম্বন। জীবনানন্দের উপন্যাসটি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে লিখিত এবং তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মতোই জীবৎকালে অপ্রকাশিত। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন থেকে ভূমেন্দ্র গুহর সম্পাদনায় ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাসটি। নাতিদীর্ঘ উপন্যাসটির সঙ্গে আছে সম্পাদকের প্রাক্-কথন এবং বিস্তৃত টীকা। *সফলতা নিষ্ফলতা*-কে ভূমেন্দ্র গুহ আত্মজৈবনিক উপন্যাসরূপে চিহ্নিত করেছেন, যা খুবই স্বাভাবিক। কারণ জীবনানন্দের অধিকাংশ উপন্যাসেই তাঁর আত্মজীবনীর উপাদান বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত। কিন্তু কথা হল আত্মজীবনীমূলক এই উপন্যাসটিকে আমরা এখানে আলোচনায় রাখছি কেন। রাখছি এইজন্যই প্রথমত ভূমেন্দ্র গুহ তাঁর টীকাগুলির মধ্য দিয়েই যেন একটি উপন্যাসোপম জীবনী রচনা করেছেন। জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু এবং সেই সময়ের বৃত্তকে বিস্তৃত

খুটিনাটি সহ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। তদুপরি এই সম্পাদিত উপন্যাসটির লেখক-রচিত অন্তঃকথন এবং সম্পাদক-রচিত টীকা-সম্ভার অবলম্বন করে কেতকী কুশারী ডাইসন তাঁর *তিসিডোর* উপন্যাসের ভেতরে রচনা করে গেছেন আরও একটি জীবনী উপন্যাসের খসড়া। সেই অ-লিখিত উপন্যাসের কেন্দ্রে আছেন জীবনানন্দ দাশ এবং বুদ্ধদেব বসু দুজনেই। প্রকৃত অর্থে জীবনী-উপন্যাস এগুলির কোনোটিই নয়। তবু, জীবনানন্দের পাঠকদের কাছে উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে কেতকী কুশারীর এই আলোচনাসমূহ যথেষ্ট আকর্ষক মনে হবে; সর্বদা গ্রহণযোগ্য যদি নাও হয়।

আমরা এবার প্রথম দুটি উপন্যাসের প্রসঙ্গে আসব। যে-দুটি নিঃসন্দেহেই জীবনী-উপন্যাস। দুটিরই কেন্দ্রীয় চরিত্র জীবনানন্দ দাশ। অনেকটাই স্বনামে এবং স্বরূপে। তাঁকে উপন্যাসে চিনে নিতে এবং অনুভব করতে কোনো বাধাই ঘটে না।

অল্পসময়ের ব্যবধানে জীবনানন্দ দাশকে কেন্দ্রে রেখে লেখা হয়ে গেল দুটি সম্পূর্ণ উপন্যাস এই ঘটনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আপাতভাবে জীবনানন্দ দাশের জীবন বিশেষ ঘটনাবহুল নয়। ঘটনা বলতে এখানে আমরা 'ইনসিডেন্ট' বোঝাতে চাইছি না, বলতে চাইছি 'অ্যাকশন'। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো তাঁর জীবনে ধর্মান্তর গ্রহণ, বাংলার বাইরে এবং ভারতের বাইরে চ্যালেঞ্জিং জীবনযাপন; বিবাহ, পরিবার ত্যাগ, পুনর্বিবাহ (হয়তো বা আইনসিদ্ধ বিবাহ নয়), সম্পদ ও রিক্ততার মধ্যে দোলায়মানতা এবং অমিত সাহিত্য-প্রতিভার বিস্ফোরিত তেজে বাঙালি পাঠককে চকিত করে দেওয়া, বাঙালির কাব্যমনস্কতায় হঠাৎ করে বিপুল পরিবর্তন এনে দেওয়া — এরকম কিছু ঘটেনি জীবনানন্দের জীবনে। অবশ্য বাঙালির কাব্যমনস্কতায় অভিনব এক বাঁক এনে দিয়েছেন জীবনানন্দও। তবে তা ঘটেছে অতি ধীর গতিতে, মনের ভিতর থেকে, যেন বা সন্তর্পণে; আকস্মিক উল্কাপাতের মতো করে নয়। কাজী নজরুল ইসলামের মতো দারিদ্র্যের অনিশ্চয়তা, সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কিশোর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া, প্রেম ও বিবাহ সংক্রান্ত নাটকীয়তা, আবির্ভাবেই পাঠককুলকে চমকিত ও আপ্লুত করে দেওয়া; রাজনীতি, সাংগীতিক প্রতিভা, সভা-সমিতি-পত্রিকা-লেখা; রেডিয়ো ও গ্রামোফোন রেকর্ডের পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান করে নেওয়া গ্ল্যামারও জীবনানন্দের যাপিত জীবনে পাওয়া যায় না। জীবনানন্দ দাশ যেন বেঁচেছিলেন জনমানসের কৌতূহল-দৃষ্টির অন্তরালে। যতদিন বেঁচে ছিলেন খুব বেশি মানুষ তাঁকে চিনতেনও না। জীবৎকালে লিখিত গল্প-উপন্যাস রেখেছিলেন ট্রাঙ্ক-বন্দি। অল্প কয়েকটি কবিতার বই, মুষ্টিমেয় অনুরাগী পাঠক, বেশকিছু সমালোচক এবং অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের ঔদাসীন্যের মধ্যেই তিনি অকালে চলে গিয়েছিলেন। 'রক্তাপ্লুত ট্রাম থেমে গেল' — লিখেছিলেন বিনয় মজুমদার। জীবনানন্দের চলে যাওয়াও যেন তেমনই। অতি নিভৃত, অন্তর্বর্তী রক্তক্ষরণের বিষাদ ও যন্ত্রণায় আকীর্ণ এক জীবন যেন থেমে গেল হঠাৎ।

তিনি ব্রাহ্ম পরিবারের সুপরিমিত, প্রথাসিদ্ধ আদর্শ লালিত, আস্তিকতায় বিশ্বাসী বাল্য ও কৈশোর জীবন পেয়েছিলেন। কোথাও কোনো বিদ্রোহ ছিল না। কলকাতার কলেজে পড়েছিলেন ছাত্রাবাসে ও মেস-এ থেকে। আপাত দৃষ্টিতে কলকাতার নাগরিকতার বৃত্তে আরও পাঁচটি বহিরাগত তরুণের মতোই তাঁর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন। তাঁর বিবাহ হয়েছিল অভিভাবকদের

ব্যবস্থাপনায়, নিয়মমাফিক ব্রাহ্ম সমাজে। শিক্ষাগত যোগ্যতা সত্ত্বেও অধ্যাপনার চাকরি থেকে বার বার তিনি কর্মচ্যুত হয়েছেন — কখনো ঘটনাচক্রে, কখনো কলকাতার বাইরে থাকতে পারবেন না বলে, কখনো অস্থায়ী চাকরিকে স্থায়ী করে নেবার প্রচলিত প্রক্রিয়াগুলিকে আয়ত্ত করতে না পেরে। অনেকসময়ই তিনি উপার্জনবিহীন বেকার থেকেছেন। চাকরি খুঁজে নেবার উদ্যম তাঁর ছিল না তেমন। এই ধরনের কাজে কোনো উৎসাহই ছিল না। যখন কলকাতায় গিয়ে চাকরির সন্ধান করাই বাস্তবের দিক থেকে একান্ত কর্তব্য ছিল তখন বাংলার মফস্‌সলে আম-জাম-হিজলের বনে শ্যামা আর শালিকের গান শুনে আর ওড়াউড়ি দেখে আত্মমগ্ন সময় অতিবাহিত করেছেন নিতান্তই যুক্তিহীনভাবে। একটু রোজগারের জন্য, শান্ত একটি ঘরের কোণের জন্য, একটি প্রেমের জন্য এবং কিছু পাঠকের জন্য আকুল তৃষ্ণার্ত ছিলেন সারাজীবন। কোনোটাই তাঁর পাওয়া হয়ে ওঠেনি। চাকরিসূত্রে দিল্লি, কিশোর বয়সে হয়তো বা অসম, দেশবিভাগের পর বাধ্য হয়ে কলকাতা — এছাড়া কোথাও কখনো যাননি, যাবার চেষ্টাও করেননি। নিজের মনকে মেলে ধরেছেন কেবল লিপির শিল্পে। সেখানেও — যে গদ্য-লেখাগুলিতে তাঁর অনেকখানি অনাবৃত আত্মপ্রকাশ সেগুলি পাঠকের সামনে এল তাঁর প্রয়াণের অনেক পরে সাম্প্রতিককালে। তাঁর গল্প, উপন্যাস এবং ডায়রি — বস্তুত নিজের জীবন-উপন্যাস তিনি নিজেই লিখে গেছেন এই গদ্য রচনাগুলিতে। এই গদ্য-পৃষ্ঠাগুলি থেকেই পাঠকের সামনে উঠে এসেছে গভীরভাবে অন্তর্মুখী, বাণিজ্য-বুদ্ধির পার্থিব জীবন থেকে নিঃসীম বিমুখতায় সরে থাকা এক মানুষের অন্তর্গূঢ় জীবনশিল্পের মনশ্চরিত্র।

এখানে 'বাণিজ্য-বুদ্ধির পার্থিব জীবন' বাক্যবন্ধটিকে একটু বিস্তৃত করতে চাই। ব্যাবসা, বাণিজ্য, কারবার — শব্দগুলির প্রতি অত্যন্ত অযৌক্তিক এক বিরাগ আছে অনেক মানুষের, বিশেষ করে বাঙালির। কিন্তু মানুষের জীবন প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিকতারই জীবন, জীবজন্তুর জীবন তা নয়। একমাত্র মানুষেরই বেঁচে থাকার জন্য বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রয়োজন হয়। মানুষের প্রয়োজন বহুবিধ। তাই যখন মুদ্রার আবিষ্কার ঘটেনি তখনও মানুষকে বাণিজ্য করতে হয়েছে। হয়তো বা খাদ্যশস্যের বিনিময়ে পশুচর্ম, অরণ্য সম্পদের বিনিময়ে গবাদিপশু, নৌকোর বদলে তির-ধনুক। এই বিনিময়-ব্যবস্থা এবং বিনিময়-বুদ্ধিটাই বাণিজ্য। মুদ্রার প্রচলন এই ব্যবস্থাটিকে মসৃণ, আন্তর্জাতিক এবং বাজারসহ করেছে অনেক পরবর্তীকালে। সেজন্য মানুষকে সর্বদাই বাঁচতে হয় নিজেকে বিক্রি করে। কখনো শরীর — যৌনতা অথবা দেহশ্রম — তার বিক্রির উপকরণ; কখনো সে বিক্রি করে তার মেধা ও দক্ষতা। এই বাণিজ্য-বৃত্তির চাকা থেকে মুক্ত মানুষ পৃথিবীতে থাকা সম্ভবই নয়। কিন্তু জীবনানন্দের মনের গঠনে সেই অসম্ভবের পরিমাণ ছিল অনেকখানি। তিনি চাকরির চেষ্টায় কাতর হন, অথচ স্ত্রী-কন্যাসহ স্বগৃহে প্রৌঢ় পিতার উপার্জনের পয়সায় দু-বেলা হাত পেতে নেন ভাতের থালা। যখন কয়েকটি ছাত্র পড়ালেও সংসারের চাকায় কিছু তেল জোগানো যায় তখন তিনি পৃথিবীর রূপ পরিহার করে বাংলার মুখের দিকে চেয়ে নিজের হৃদয়কে প্লাবিত করে দেন। এই পর্যায়ের বাণিজ্য-বৈরাগ্য মানুষকে সুখী করে না। জীবনানন্দও সুখী হননি। কিন্তু সে-জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়, তিনি নিজেই নিজের নিয়তি। মধুসূদনের যেমন ছিল মদ্যপানাসক্তি, নজরুলের যেমন ছিল অনিয়ন্ত্রিত জীবন-উল্লাসের প্রাচুর্যময় অযৌক্তিকতা, তেমনই জীবনানন্দের

এই বাণিজ্য-বিমুখতা। আজকের পাঠক কবি জীবনানন্দকে সশ্রদ্ধ অনুরাগ নিবেদন করেন, তাঁর চিত্তনিহিত যন্ত্রণার সহমর্মীও হয়ে ওঠেন কিছুটা, কিন্তু নিজের পরিবারে একজন জীবনানন্দ থাকলে কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ সদস্যদের পক্ষে তাতে খুশি হওয়া সম্ভব নয়। দাম্পত্য জীবনে জীবনানন্দ তৃপ্ত ছিলেন না। কারণ তাঁর পত্নী লাবণ্য স্বামীর এই স্বভাবে ছিলেন বিরক্ত। শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন স্বামী ও কন্যাসহ শ্বশুরবাড়ির গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়েছে তাঁকে। কেমন করে ভালো থাকবেন! জীবনানন্দ-পত্নী লাবণ্যপ্রভার টিকে থাকার সংগ্রামকে আবৃত করে রেখেছে জীবনানন্দের কবি-প্রতিভার আলোক বলয়। মানুষের সংস্কৃতিতে প্রতিভাবানের এই লাইসেন্স থেকে যাবে চিরকাল। কিন্তু লাবণ্যপ্রভার সংগ্রামের দিকটিও আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সেই যুগে চারবছরের শিশুকন্যার জননী লাবণ্য ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের বি এম কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছিলেন। শিক্ষকতা করতেন বরিশালে। দেশভাগের পর কলকাতায় এসে ১৯৪৮-৪৯-এ পড়িয়েছিলেন কমলা গার্লস স্কুলে। শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রম (তখন বলা হত বি টি ট্রেনিং) ১৯৫০-৫১-এ সম্পূর্ণ করেছেন ডেভিড হেয়ার ইনস্টিটিউশনে। পরীক্ষা দিয়েই আবার চাকরি নিয়েছেন কয়েক মাসের জন্য দেশপ্রাণ স্কুলে। বি টি ডিগ্রি পাবার পর যোগ দেন শিশু বিদ্যাপীঠ স্কুলে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে। কিসের জন্য, কার জন্য তাঁর এই শ্রম? তখনও পর্যন্ত মেয়েদের চাকরিকে মর্যাদার অধিকার বলে মনে করা হত না, অভাবের সংসারে ঠেকা দেবার দায়িত্ব বলেই মনে করা হত। জীবনানন্দকে প্রধান চরিত্র করে উপন্যাস লেখা হচ্ছে, হয়তো আরও হবে। তাতে আমরা খুশি। কিন্তু প্রত্যাশার পাত্রটি পূর্ণ হবে তখনই যখন লাবণ্যপ্রভা দাশকেও দেখতে পাব কোনো উপন্যাসে প্রধান চরিত্র রূপে।

আপাতত আমরা আমাদের হাতের উপন্যাসগুলির দিকে তাকাই। প্রদীপ দাশশর্মা-র *নীল হাওয়ার সমুদ্রে* এবং সুরঞ্জন প্রামাণিকের *সোনালি ডানার চিল* দুটি উপন্যাসেই জীবনানন্দের জীবনের বহিরঙ্গ ঘটনা-প্রবাহ, অন্তরমগ্ন মনঃস্থাপত্য, পারিবারিক বৃত্তের খুঁটিনাটি, ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ ধরনের অবস্থানজনিত বৈশিষ্ট্য এবং জীবনানন্দের সমকালের ভারত বিশেষ করে বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পটভূমিটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং তার ফলেই জীবনানন্দের জীবন-চারণ-ভূমি খুব ঘটনাবহুল না হলেও দুটি উপন্যাসেই পেয়েছে যথেষ্ট বিস্তার, একদিকে তা মনের গভীরতর তলে শিকড় নামিয়ে দেওয়ার মতো; অন্যদিকে তা সমাজ-জীবনে বিস্তীর্ণ জালের মতো অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো।

ভেবে দেখতে গেলে বিশ শতকের প্রথমার্ধ ভারতীয় উপমহাদেশের অস্তিত্বের দিক থেকে বিপুল গুরুত্বপূর্ণ একসময়। যে গুরুত্ব সম্ভবত বিগত পাঁচশ বছরেও দেখা দেয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ এই সময়। ভারতীয় জনমানসে ব্রিটিশ উপনিবেশের কাল থেকে যে আন্তর্জাতিকতার উপলব্ধি ধীরে ধীরে চারিয়ে যাচ্ছিল তার আলোড়িত পর্ব এবং তুঙ্গতম শিখর স্পর্শ এই পর্বেই। এই সময়েই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এবং ভারত-রাষ্ট্রের অঙ্গচ্ছেদ। বহুবিধ জটিলতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা এবং বহুসংখ্যক উদ্‌বাস্তু মানুষের সংকট দেখা দিয়েছে এই সময়ে। জীবনানন্দও ছিলেন সেই উদ্‌বাস্তুদেরই একজন।

জীবনানন্দকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে গিয়ে দেশকালের এই সুবিস্তৃত পরিসরকে খুব সহজেই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছেন দুই উপন্যাসিক। তার কারণ জীবনানন্দ বাস্তব সংসারে খুব সক্রিয়তা দেখাতে না পারলেও তাঁর মনের মধ্যে ছিল আশ্চর্য এক শোষণ-শক্তি। বহির্বিশ্বে যে আলোড়নগুলি তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগ না রেখেও জীবনানন্দ সেই উথাল-পাথালের নির্যাস টেনে নিতে পেরেছিলেন নিজের মনের মধ্যে। কাজেই তাঁকে প্রধান চরিত্ররূপে স্থাপন করে যদি কোনো লেখক একটি উপন্যাস রচনা করতে চান তাহলে সেই প্রধান চরিত্রের অন্তর্মুখ ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরবার প্রয়াসে তাঁকেও পরিভ্রমণ করতে হবে বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিবৃত্তের পথে পথে।

লেখকেরা জীবনানন্দের এই বিশেষ ধরনের মনের গড়ন বুঝতে গিয়ে প্রধানত অবলম্বন করেছেন তাঁর লেখা কবিতা, গল্প এবং উপন্যাস। একথা বললে ভুল হয় না যে, জীবনানন্দ নিজেই তাঁর আত্মজীবনীকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছেন এইসব লেখার প্রতিটি ছত্রে। সেইসঙ্গেই আবিষ্কৃত হয়েছে জীবনানন্দের দিনলিপি। যে দিনলিপিতে অতি সংক্ষিপ্ত এবং কখনো কখনো প্রায় সাংকেতিক ভাষায় উৎকীর্ণ আছে জীবনানন্দের বহির্জীবন ও অন্তর্মনের বহুবিধ সুখ, দুঃখ, সংশয়, যন্ত্রণা এবং নৈরাশ্যের চিহ্নগুলি।

তাঁকে খুব সহজ-সরল মানুষ বলা যায় না। খুব স্বাভাবিক মানুষও তিনি ছিলেন না। তাঁর ছিল নিজের মতোই জীবনযাপন করবার জেদ। নিজের অপছন্দের কাজ স্ত্রী-সন্তান-পরিজনদের জন্যও করতে অক্ষম ছিলেন তিনি। বেশ কিছুটা আত্মপরতাও ছিল তাঁর, যেমন থাকে প্রায় সব শিল্পীর। স্রষ্টা শিল্পীদের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তাঁদের নিকটজনকে। ঠিক ততটাই সানন্দে ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না লাবণ্য। তাঁদের দাম্পত্য জীবনের ট্র্যাজেডিটা ছিল সেখানেই। নারীর হৃদয় ও শরীরের জন্য জীবনানন্দের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সেই চাওয়াকে পাওয়ায় পরিণত করবার জন্য যে পরিমণ্ডল প্রয়োজন ছিল তা তাঁর ছিল না। সেই পরিমণ্ডল গড়ে নেবার ক্ষমতাও ছিল না তাঁর। ফলে সাংসারিক জীবনে, বৈষয়িক জীবনে, মানুষের পক্ষে আবশ্যিক বাণিজ্যিক জীবনে তিনি অসফল ও ব্যর্থ একজন মানুষ হয়েই থাকলেন।

জীবনানন্দকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে গিয়ে প্রদীপ দাশশর্মা এবং সুরঞ্জন প্রামাণিক — দুই ঔপন্যাসিককেই বিশ শতকের প্রথমার্ধের বঙ্গভূমির সমগ্র ইতিহাসটি অধিগত করতে হয়েছে। সেই সময়ের রাজনীতি, অর্থনীতি, ঔপনিবেশিক বাতাবরণ, বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত এবং দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকা সাংস্কৃতিক বাতাবরণ — সবকিছুকেই জীবন্ত করে তুলতে হয়েছে তাঁদের। উপরন্তু ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে ব্রাহ্মসমাজের চিত্র। এবং তাঁরা তা পেরেছেন দুজনেই। জীবনানন্দের চোখ ও মন দিয়ে তাঁদের দেখতে হয়েছে সমাজ ও পরিবারকে; প্রেম ও নারীকে, প্রকৃতি ও কলকাতার মেস-হস্টেলের জীবনকে। সেইসঙ্গে লেখালেখির জগৎটিকেও।

তাঁদের সর্বাধিক সাহায্য করেছেন জীবনানন্দ স্বয়ং। জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাস ও ডায়রি-র পৃষ্ঠাগুলি না পেলে সম্ভবত এই উপন্যাস লেখা যেত না। সেইসঙ্গেই মনে রাখতে হবে জীবনানন্দ-গবেষক ক্লিন্টন বুথ সিলি রচিত জীবনানন্দ-জীবনী *আ পোয়েট আপার্ট*-এর কথা। ১৯৯০-এ

প্রথম প্রকাশিত এই অসামান্য গবেষণা গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ 'অনন্য জীবনানন্দ' ঢাকা থেকে ২০১১-তে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন ফারুক মঈনুদ্দীন।

দুটি উপন্যাসকে নিয়ে একসঙ্গে কিছু বলতে যাবার সমস্যা এই যে, আলোচনার ভাষায় উপন্যাস দুটির পার্থক্য তুলে ধরা কঠিন। জীবনানন্দ এত পুরোনো দিনের মানুষ নন যে, তাঁর সম্পর্কিত তথ্যাবলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঔপন্যাসিকের কল্পনার জন্য অনেকখানি জায়গা ছাড়া আছে — তা-ও নয়। অধিকাংশ ঘটনারই লিখিত সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাঁকে ভালোভাবে চিনতেন — এমন অনেকেই জীবিত ছিলেন কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও। ফলে ক্লিন্টন বুথ সিলি-র বইটি হয়ে উঠতে পেরেছে অনেকটাই নিশ্ছিদ্র। তবে কথাসাহিত্যের সবটুকু এবং ডায়রি-র সহায়তা পাননি সিলি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দুই ঔপন্যাসিককেই কাজ করতে হয়েছে একই তথ্যসমূহ সহযোগে। দুজনেই নিপুণভাবে এইসব তথ্যের ব্যবহার করেছেন ও বিন্যাস ঘটিয়েছেন। পার্থক্য প্রধানত দুটি উপন্যাসের কথনরীতিতে, বিন্যাসের শৈলীতে।

প্রদীপ দাশশর্মার উপন্যাস শুরু হয়েছে জীবনানন্দের বরিশালীয় কৈশোরের কাল থেকে। জীবনানন্দকে কেবল সাহিত্যপ্রাণ বললে কম বলা হয় — মানব-সভ্যতার বিবর্তনের সমস্ত খুঁটিনাটি এবং জৈব জীবনের প্রতিটি বিন্দু সম্পর্কে গভীর আগ্রহী ও নিবিড়-মনস্ক ছিলেন জীবনানন্দ। সেভাবেই শুরু হয়েছে উপন্যাসটি। প্রথম পৃষ্ঠাতেই এসে গেছে মনিয়া-র প্রসঙ্গ। *রূপসী বাংলা*-র কবিতায় 'কামরাঙা লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো। গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে —' এবং অন্যত্র 'মনিয়ার ঘরে রাত'। এই মনিয়া এক পর্তুগিজ পাদ্রির কন্যা — হিন্দু বাঙালিনির গর্ভে তার জন্ম। মনিয়ার গলায় ক্রস ঝোলে। তবু সমাজে তারা কিছুটা একঘরে ছিলই। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ তাদের অনেকটাই আশ্রয় হয়ে দাঁড়ান। সেইসূত্রে মনিয়া কিশোর মিলুর সঙ্গিনী। জীবনানন্দের ডাক নাম মিলু। দুই লেখকই এই নামটি ব্যবহার করেছেন।

অনেকটা জীবনী রচনার শৈলীতেই সাল ধরে ধরে প্রদীপ দাশশর্মা অগ্রসর হয়েছেন। লিখনশৈলীতে মিশে আছে জীবনানন্দের মননজীবিত, অধ্যয়নশীল স্বভাবের আভা। সাহিত্যের দিক-দিগন্ত, ভাষা ও শব্দের কারিগরি, লোকগান আর ছড়া, ব্রাহ্ম-পরিবারের সংস্কৃতির বিভিন্ন চিহ্ন; আর প্রকৃতির তৃণ-পল্লব, ফল-ফুল, নদী-গাছ-আকাশ, অজস্র পাখি। প্রদীপ দাশশর্মার লেখার ভঙ্গিটি বিবৃতিমূলক নয়, সংকেত-মূলক। অনেক সময়ে ছাড়া ছাড়া শব্দ ঝরিয়ে দিয়ে সংক্ষেপে অনেক বিস্তারের ঘনীভূত প্রতিচ্ছবি। এই মিতভাষিতা উপন্যাসটিকে চমৎকার শৈল্পিক ব্যঞ্জনা দিয়েছে। অতি অল্প পরিসরে জীবনানন্দের কৈশোরের ও যৌবনের চলচ্চিত্র চমৎকার ফুটে ওঠে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।

১. মনিয়া বাপু, অতশত জানে না। না জানলেই বা কী! বাইবেল-ক্লাসে শুনেছে, নোহর নৌকার কথা। প্রজাতি-রক্ষার পরিকথা। নৌকার মধ্যে শুধু চলা নেই, আছে বিশ্রামও। ৪০ দিন, ৪০ রাতের পর বৃষ্টি থামে। স্বস্তি। মায়ের ফেরিঘাটে বসে থাকার মধ্যে, বোঝে, এক অসীম বিশ্রাম। কীর্তনখোলার জলে ভাসমান ডক। আছে ড্রাই-ডক। মা

ভাসমান না ড্রাই — বোঝে না মনিয়া। মা'র বিশ্রাম না অপেক্ষা, স্থির করতে পারে না। তখনও মিলু ভ্রূক্ষেপহীন বলে যাচ্ছে :

— 'নৌকো' শব্দটা কত মজার! দেশে, দেশে, 'ন' দিয়ে শুরু কথাটা। গ্রিসে 'naus', লাতিনে 'navis', ওল্ড-জর্মনে 'nacho', ইংরেজিতে 'naval' তো আছেই। 'ন' ... 'ন' ... করে' সুর ভাজে মিলু। মনিয়ার কানে কিছু যায় না। মা'র কথা হাল্কা শোলা। জলে ঘোরে। 'নৌকা নষ্ট হলে ঘর নষ্ট' : বরিশালে কথাটা বড়ো ঠিক। 'চাষির কদর ঢাকা আলে/নৌকার কদর বরিশালে।' মিলু আনমনা মনিয়াকে ঠেলা মারে : 'বাকলায় বজরারে কয় কোষ, ঢাকায় পিনিস/সাঁতার জানিস্ নে তুই/ডুবলে ফিনিশ।' এ নিছক মজা। নইলে, বিলক্ষণ জানে, মনিয়া সাঁতারে পটিয়সী।

২. ১৯২৬। মিলু লিখে ফেলে 'নীলিমা'। ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক ভেঙে যায়। চরণে জড়ায়ে গেছে শাসকের কঠিন শৃংখল। কুসুমকুমারীর অদৃশ্য শৃংখল থেকে দু'ভায়ের মুক্তি নেই কোনো। পরিস্থিতির কোলের কুকুর তারা। সহস্র ভাঁটার টান। একের পর এক। অজস্র সুতোয় বন্দি বিপুল গালিভার। ছিন্নতা চায় সে। মোহিতলাল, নজরুল, রবিবাবুরা তার কবিতার জানলায় চপল নারীর মতো উঁকি মারে। ওঁদের থেকে সরে আসতে চায় মিলু। বাতায়ন খোলা। সহসা, মতির মা মনোমুকুরে। কতো গল্প, ছড়া, পরণকথা, ব্রত, লোককাহিনী, ওঁর স্মৃতিতে! আঁচলে সৃষ্টির জরি — সোনার, রুপোর। এমন সৃষ্টির আঁচল জড়াতে হয়। নইলে কীসের পদ্য! মানুষের কাছে যেতে হবে। ওহ্, নো আইভরি টাওয়ার। সুধীন দত্তের বুদ্ধিবাদ নয়। ভাবতে-ভাবতে সে ক'দিন যাবত ভারী আনমনা। মাথার ভেতরে একটা শঙ্খচিল ওড়ে। হঠাৎ, ছোঁ। মিলু লেখে : 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল/ডালিম ফুলের মতো লাল যার গাল, চুল যার শাঙনের মেঘ ... আর আঁখি গোধুলির মতো, গোলাপি রঙিন।' এই প্রথম, মিলু নিজেও বোঝে, সে অন্য কেউ। কৃত্রিম ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে, 'বর্ষ আবাহন' থেকে, প্রাকৃতে, কলোকালে, রূপকথায়। মুছে যায় আগের জলছাপ : কুসুম, রবিবাবু, মোহিতলাল, নজরুল ...।

৩. চৈত্রে আর লকলকে লাউডগা মেলে কোথায়! লাউ তখন পেকে ডুগডুগি। লাউফুল পাবে কোথায়! তবু দেবিকে সব দিতে চায় ওরা। মিলুও লাবিকে সব দিতে চায়। থাকুক বা না থাকুক। শুধু কোন্ ফুলে সন্তুষ্টি ঠাওর করতে পারে না। বেশিরভাগ জিনিসপত্র মেসে রেখে এসেছে। বিশেষত, ট্রাঙ্কভর্তি পাণ্ডুলিপি। গল্প-উপন্যাস-পদ্য, ওয়াইর চিঠি, অপর্ণার মনোবাসনা, বনলতা। বয়ে আনে নি। সঙ্গে আছে তবু। হৃদয়ের ফর্মালিনে ভেজা। জানে, লাবি পড়লে ফের অশান্তি হবে। তাছাড়া চিঠিপত্রে মেয়েদের আদিম ঝোঁক। ডায়েরিটাও রেখে এসেছে। অবশ্য বুঝতো না কিছু। সাংকেতিক। পৃথিবীতে মানুষের সবকিছু সামাজিক হওয়ার কারণে সবটা সাংকেতিক। হা-হা, 'Man is a symbolic animal.' এমন কি মানুষের এন্তেকাল হলেও জীবিতেরা মুখোশ খোঁজে। সে, বাপু, সহজ কথা না।

৪. লাবি আর আগের লাবণ্য নয়। ঢাকার বালিকা কলকাতায় মুক্ত। অনেক জল বয়ে গেছে। পার্কসার্কাসে 'শিশু বিদ্যাপীঠ'-এর দিদিমণি সে। শিশুসুলভ বিশৃংখলা নেই। লঘু বাতাসে, কাঁকড়ার মতন শরীরে খসে-পড়া আঁচল সে অনায়াসে জড়িয়ে নেয়। কলকাতার মতো লোহার শহরে ঝুলে থাকে। মিলু টের পায় না, কলকাতা অয়স। একটা লোহার সিঁড়ি লাবির গা দিয়ে ঝুলে আছে। সে এক ছিন্ন ঘুড়ি। বুকের রঙিন কাগজ ভিজে যায় মাঠের ওয্-এ। উইংসের আড়াল থেকে তখন সময়ের পরুষ-কণ্ঠ : 'তুলো না। ছিঁড়ে যাবে।' চোখের অলস কোণ দিয়ে পর্যন্ত লাবি মিলুর দিকে তাকায় না। অন্তত, তার সেকথা মনে হয়। তখন হত্যার পিপাসায় সে। লাবি কি টের পায়! মুন্সি, সাভারকর, নরীম্যান — তিন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখে মিলু। জগতে ব্যক্তির পিপাসা কী সব! 'ব্যক্তি' এক জেনেরিক টার্ম। অতএব, লাবিও আছে তাতে। নারীর পিপাসা।

ছোটো ছোটো শব্দ, শব্দবন্ধ ও বাক্যাংশ ব্যবহার করে জীবনানন্দের সমগ্র জীবন, মনন ও হৃদয়-বাসনাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। সংকেতের মতোই প্রায়। যে-পাঠকের ভালোভাবে পড়া নেই জীবনানন্দের রচনাসম্ভার ও ডায়েরি তাঁর পক্ষে প্রদীপ দাশশর্মার উপন্যাসটি অনুসরণ করা কঠিন।

প্রদীপ দাশশর্মা উপন্যাসটিতে কিছুটা পিছিয়ে গেছেন সত্যানন্দ-কুসুমকুমারীর জীবনে। মেধাবী ছাত্রী কুসুম, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য, কবিতা লেখায় পারদর্শিনী। কিন্তু স্কুলে থাকতেই বিবাহ। যদিও ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত সুপাত্র সত্যানন্দের সঙ্গে। এবং সেইসূত্রে কবিতার চর্চায় সম্পূর্ণ ছেদ পড়েনি, তবু সংসারের চাকায় প্রতিভার অনেকটাই পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কুসুমকুমারীর মনের সেই শূন্যতার দিকটি কিছুটা তুলে ধরেছেন লেখক। ব্রাহ্মসমাজের সুচর্চিত আদর্শবাদী প্রচ্ছদের অন্তরালে যে পুরুষতান্ত্রিকতা ও রক্ষণশীলতা ছিল তা স্পষ্টভাবেই উঠে এসেছে।

জীবনানন্দই উপন্যাসের উদ্দিষ্ট মানুষ। তাঁর ডায়েরিতে উল্লিখিত ওয়াই (Y) সংকেতের রমণী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যখন থেকে গবেষকদের চোখে পড়েছে তখন থেকেই তাকে নিয়েও চলেছে প্রভূত জল্পনা। যশোমতী নাম দিয়ে সেই মেয়ের প্রসঙ্গ এসেছে উপন্যাসে। এসেছে লাবণ্যের সঙ্গে বিবাহের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। চাকরিতে ফিরে না-যাওয়া জীবনানন্দের কন্যার জন্ম বিবাহের প্রথম বছরেই। লাবণ্যর মন জীবনানন্দের প্রতি বিরূপ। পরিবারের কেউই তুষ্ট নয়। কিন্তু অপরাধী কে? এই জীবনানন্দকেই যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন লেখক।

প্রদীপ দাশশর্মার উপন্যাসটি এক অর্থে বরিশালের সর্বানন্দ ভবনকেই অবলম্বন করেছে, কেবলই জীবনানন্দকে নয়। তাই সর্বানন্দের কন্যা, সত্যানন্দের বোন স্নেহলতার সঙ্গে মনোমোহন চক্রবর্তীর প্রণয়ের উপ-কথাবৃত্তটি যথোচিত গুরুত্ব পায়। হিন্দু মনোমোহনের সঙ্গে বিবাহ দিতে নারাজি সর্বানন্দ ভবন। মনোমোহন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হলেন। তখন আবার স্নেহলতা রাজি হলেন না। তাঁর সংশয় মনোমোহনের প্রতি — এত সহজে ধর্মত্যাগ! আবার তাঁর অভিমান নিজের পরিবারের প্রতিও। মানুষটার চেয়ে ধর্মই বড়ো হল! অল্প রেখায় স্নেহলতা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন।

সেইসময়ের বিচিত্র বহুমুখীনতা উপন্যাসটিকে সারাক্ষণ টানটান করে রাখে। ব্রাহ্মসমাজ,

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সাম্যবাদের হাওয়া। রণেশ দাশগুপ্ত-র চরিত্রটি গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া জীবনানন্দের লেখার জগতের বন্ধুরা — বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত — সেইসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথাও এসেছে। বি.এম.কলেজে যতদিন অধ্যাপনার চাকরি ছিল তাঁর ততদিন কিছুটা স্বস্তির জীবন। লাবণ্য মোটের উপর খুশি। তারপর জীবনানন্দের জীবনের শেষ পর্ব, স্বাধীনতা, দেশভাগ। কলকাতায় পুনশ্চ কর্মহীন জীবন; উপার্জনহীন আর্ত বেঁচে থাকা। বাসাবাড়িতে অশান্তি। সাব-লেট করেছিলেন যে মহিলাকে তাঁর আপত্তিকর আচরণ। তারই মধ্যে অনুগত ও বন্ধু ছোটোভাই অশোকানন্দ ও তাঁর স্ত্রী নলিনী — ভেবলু ও নিনি একটু সান্ত্বনার আশ্রয়। এই দম্পতি তাঁকে বোঝেন। কিন্তু নিয়মিত অর্থাগম না থাকলে কেবল সান্ত্বনা ও সাময়িক সাহায্য সংসারে কতটুকু ফলপ্রসূ হতে পারে! সুনিশ্চিত বাণিজ্যিক পরিসরই তো মানুষের প্রকৃত আশ্রয়।

সেই ন্যূনতম আশ্রয় পাওয়া হয়নি জীবনানন্দের। যদিও একেবারে শেষ জীবনে হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপক রূপে অনেকটাই স্থিত হয়েছিলেন। কর্মজীবনে প্রথম মর্যাদা পেয়েছিলেন সেখানেই। এই অংশটি প্রদীপ দাশশর্মা কিছুটা পাশ কাটিয়ে গেছেন। শেষ জীবনে কবিরূপেও পেয়েছিলেন কিছু সম্মান। কিন্তু জীবনানন্দের হৃদয়ের শূন্যতাবোধ ও অ-শান্তির শিখাটির উপরই মূলত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন ঔপন্যাসিক।

হাসপাতালে জীবনানন্দের মৃত্যু-মুহূর্তটিতেই উপন্যাস শেষ করেছেন লেখক। যে অনুরাগী তরুণেরা তখন জীবনানন্দকে ঘিরে ছিলেন সেই ভূমেন্দ্র, স্নেহাকর, জগদিন্দ্রের উল্লেখ নামমাত্র। উপন্যাসের পরিসমাপ্তি অংশটি উদ্ধৃত করলে প্রদীপ দাশশর্মার কথনরীতির বিশিষ্টতা পুনশ্চ অনুভূত হবে। এই উপন্যাসটির ভাষা-ব্যবহার ও কথন-শৈলী খুবই অভিনব ধরনের। জীবনানন্দের জীবনালেখ্য রচনার কাজে এই শৈলী স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

> নিমুনিয়া। ডা: বাসু ইঞ্জেকশন দিয়ে চলে গেলেন। স্টেথো-বুবু আরো গম্ভীর। লাল-ওয়ার্ডের বাইরে যুবাদের জটলা। পালা করে জাগে। কখন কী দরকার হয়! ওষুধপত্র, অক্সিজেন। মঞ্জু বাবার শিওরে। এম্নিতে থাকার কথা না। সাধও নেই। ডাক্তার সুবিধের বোধ করছেন না, তাই। রঞ্জু বাইরে। হাসপাতালের সিঁড়িতে। ভূমেনদের থেকে দূরে। ওঁরা সিনিয়র। মিলুর কি জ্ঞান ফেরে! চোখ খোলে। রোগা মেয়েটা তার বুকের কাছে। এমন ভাবে কোন দিন পায়নি। তারই মতো বাইসন-জেদি। মেয়ের হাত, নগ্ন-নির্জন হাত নিজের ঠোঁটে, আল্‌তো, রাখে। অশ্রুতে-লালায় ভরে যায় বালিকার করতল। দিগন্তে ধূসর পাণ্ডুলিপির রং। চোখ বুজেও দেখতে পায়।
>
> রাত দশটা। মিনিট পাঁচেক আগে ডাক্তার রাউন্ড দিয়ে গেছেন। গাড়লের মতো কেশে যাচ্ছে গাঁও-বুড়ো কলকাতা। মাঝে-মাঝে, যান্ত্রিক হেঁচকি। ট্রামলাইনের যান্ত্রিক-সিঁথি পাল্টে দিচ্ছে কেউ লৌহ-শলাকায়। শান্তি ড্রিপ বদলায়। মিলু অনন্ত ঘোরে। সাকোরখোরা ধানক্ষেত, আর, কিশোরী কাশফুলের ওপর দিয়ে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে মন্তাজের পক্ষিরাজ। নীচে মুথা-ঘাসে ছড়িয়ে আছে কলাবতী এলাচ, লাল কুঁচফল, সবুজ কামরাঙা, ছাই-রং

গুব্‌রে পোকা, ঝিঁ-ঝিঁ, হল্‌দে তেলচিটে ঘেমো ব্যাঙ ...। কুয়াশা-ঢাকা মনিয়ার মুখ। 'ও মুনাই সাধুরে, আমি কি সুমায় ভাসাইলাম রে ডিংগা ...!' মিলুর চিবুক, এক্ষণে, শিরস্ত্রাণ-শোভিত হুন-সৈন্যদের মতো আঁটো। না কি, সে বুল-রিং-এর মেয়র! হিংস্র! সতত, ক্রুদ্ধ! পৃথিবীর সদ্য-বিবাহিতাদের নির্দেশ দেবে : এই যে ঠান্ডা লোহার আংটা — যার আর-এক নাম জীবন — যেখানে আটকে রাখা হয় রক্তচক্ষু-মাতাল যাঁড়দের, চুমু খাও। সহসা, চরাচরে, ওঙ্কার। বেদ-ধ্বনি :

FIRE AM I
সে আগুন জ্বলে যায়
FIRE ARE YOU
সে আগুন জ্বলে যায়
SOAR THEN SOAR
চারিদিকে বেজে ওঠে সমুদ্রের স্বর
চূর্ণ, হিম রিস্ট-ওয়াচ। কৃষ্ণকান্ত কাঁটায় ১১টা ৩৫।

পড়ে-থাকা এক অগ্নি-শিল্পকে, সুগন্ধি রুমালে, বুকে গুঁজে নেয়। She is kindly to mortals.

সহসা, সুচরিতার চিৎকার : না-আ-আ ...
মঞ্জু ওয়ার্ড থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। অশ্রুহীন।
চারটি যুবা ভেতরে ছুটে যায় ...
ও মোর চান্দ, মোর সোনা, / ও মোক ছাড়িয়া না যান দূর দ্যাশান্তরে ...
লাবণ্য, লাবি, লাব, লা ..., চারদিক এখন ও. কে.

সোনালি ডানার চিল সুরঞ্জন প্রামাণিকের উপন্যাস। জীবনানন্দের সমগ্র জীবনকে, কিশোর বয়স থেকে শুরু করে দুর্ঘটনায় মৃত্যু পর্যন্তই অনুসরণ করেছেন তিনিও। জীবনানন্দকে এবং লাবণ্যপ্রভাকে আনন্দ ও প্রভা নামে অভিহিত করেছেন উপন্যাসে। তবে তাঁদের নিজস্ব পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখার প্রয়াস নেই। 'ওয়াই' সংকেতের মেয়েকে 'বনি' নাম দিয়েছেন লেখক।

সুরঞ্জন প্রামাণিক আখ্যানের বিবৃতিকে খুব বেশি অলংকৃত বা ইঙ্গিতময় করতে যাননি। মোটের উপর প্রথাসিদ্ধ কথনকেই গ্রহণ করেছেন। ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে স্বচ্ছন্দতর মনে হবে ভাষা। মনিয়া, বনি, প্রভা — তাঁর জীবনের অনেকখানি স্থান ব্যাপ্ত করে এই তিন নারীর অধিষ্ঠান। সঙ্গিনী প্রথম দুজন যথাক্রমে কৈশোরের ও যৌবনের প্রত্যাশা ও প্রেম-স্ফুরণের আশ্রয়। প্রভা তিরিশ বছরের পর থেকে আমৃত্যু তাঁর হৃদয়ের ও বাস্তব-সংসারের এক অমোঘ অস্তিত্ব। প্রথম দুজনের ক্ষেত্রে সম্পর্ক যতই রোমান্টিক হোক, লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে জীবনানন্দের জীবন প্রবলতর বন্ধনে জড়িত। তা আনন্দময় নয় সবসময়ে, সংঘাতময়তাই সেই সম্পর্কের মূল সুর। কিন্তু তাৎপর্যের দিক থেকে লাবণ্য-জীবনানন্দের বহির্জীবন ও অন্তর-সত্তা উভয়ক্ষেত্রেই স্থান

জুড়ে আছেন অন্য দুজনের চেয়ে বেশি। সেই সম্পর্কের স্রোতে টেনশন ও অতৃপ্তির অংশ অনেকটা থাকলেও সুখের মুহূর্তও ছিল কখনো কখনো। ঔপন্যাসিক আলো ফেলেছেন সর্বত্রই। তাছাড়া জননী কুসুমকুমারীও জীবনানন্দের মনের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন বাল্য-কৈশোরে। তাই তাঁর গুরুত্ব পুত্রের জীবনে আপাতভাবে যতটা কালিক পরিসর অধিকার করে আছে প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে তা ব্যাপ্ততর। এই আনুপাতিক সামঞ্জস্যের দিকটি সুরঞ্জন প্রামাণিক যথাযথভাবে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন।

ঐতিহাসিক বর্ণন-রীতিই ঔপন্যাসিক গ্রহণ করেছেন। তবে আগাগোড়া কালানুক্রম অনুসরণ না করে এক একটি অধ্যায়ে কালখণ্ডকে ব্যবহার করেছেন আগে ও পরে রেখে। সেইসঙ্গে ব্যাপ্তির দিক থেকেও জীবনানন্দের চিত্তলোক — যতই অন্তর্মগ্ন হোক — বহির্বিশ্বকে, আন্তর্জাতিক বিশ্বকেও কত প্রগাঢ়ভাবে মনের মধ্যে টেনে নিতে পেরেছিল তা তাঁর লেখার পৃথিবীর দিকে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। সুরঞ্জন প্রামাণিকের উপন্যাসে জীবনানন্দের পাঠের জগৎ, কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও অভিজ্ঞতা; তাঁর ভাবনায় বিশ শতকের প্রথমার্ধের পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় বিন্যাস, অর্থনীতি, দর্শন-মননের বিভিন্ন বিচত্র দিকের উদ্‌ভাস — সবই অনুভব করা যায়। সাধারণভাবে আমরা জীবনানন্দের মনোগহনের গলি-সুড়ঙ্গগুলির পথ সন্ধানেই আগ্রহী থাকি; তাঁর মননের পৃথিবী ছিল কতদূর সম্প্রসারিত তার খবর রাখি কম! কিন্তু *বনলতা সেন* পর্বের সমান্তরালে এবং *মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলা* পর্বে তাঁর মননলোকে বিম্বিত বিশ্ব-সংকট তাঁর আবেগের জগৎকেও স্পন্দিত করেছিল। বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ, বিশ্বমন্দা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি, মানবসভ্যতার স্বরূপ ও বাংলার প্রকৃতি এইসব কিছু নিয়েই তাঁর জগৎ। আমরা বাঙালি পাঠকেরা জীবনানন্দের *বনলতা সেন* আর *রূপসী বাংলা* আর তাঁর অন্তর্মুখীনতা, তাঁর অতৃপ্ত দাম্পত্যজীবন নিয়েই বড়ো বেশি ভাবিত। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে মননী বিস্তার কোনো কোনো বাঙালির অসামান্য অর্জন; কিন্তু সাধারণ বাঙালি ভাবাবেগের না-মননী জগতেই যেন খুশি থাকেন। তাই জীবনানন্দকেও ঠিকমতো আমাদের জানা হল না। সুরঞ্জন প্রামাণিক এই জীবনানন্দকে খুব ধৈর্যের সঙ্গে ধারণ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর উপন্যাসের অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে জীবনানন্দের আত্মভাবনার বিভিন্ন খণ্ড তুলে দিয়েছেন তিনি। জীবনানন্দের বিভিন্ন লেখার নির্যাস থেকেই তুলে নেওয়া হয়েছে এই ভাবনাসমূহের উপাদান। এইসব অংশের প্রবন্ধ-সুলভ আপাত-নীরসতা (?) হয়তো আবার সব পাঠকের ভালো লাগবে না।

সুরঞ্জন প্রামাণিকের উপন্যাসে জীবনানন্দের কর্মজীবন ও কবি-জীবনের অনেক বড়ো ও ছোটো তথ্য স্থান পেয়েছে। শিল্পের জগতে বা ব্যবহারিক জগতেও 'বড়ো' ও 'ছোটো' বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই। প্রাসঙ্গিকতার আপেক্ষিকতায় স্থির হয় প্রতিটি বস্তু বা অনুভবের বড়োত্ব ও ছোটোত্ব। এই জীবনানন্দকে, কেবল মনের রন্ধ্রপথের পরিচয়ে নয়, বহির্জীবনের বাস্তবতার চালচিত্রেও মূর্ত করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন সুরঞ্জন প্রামাণিক।

এজন্যই এই উপন্যাসটিতে জীবনানন্দের কথা বলতে বলতে আরও কোনো কোনো মানুষের

প্রসঙ্গ একটু বিস্তারে এসেছে। লেখিকা বাণী রায়ের সঙ্গে জীবনানন্দের একটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নারী-পুরুষ সম্পর্কের বহুচর্চিত আকর্ষণ-বিকর্ষণ নয়। এক অগ্রজ লেখকের প্রতি এক অনুজ লেখিকার শ্রদ্ধা-প্রীতি মিশ্রিত সৌহার্দ্য। সুরঞ্জন প্রামাণিক বাণী রায়কে স্থান দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। কলকাতায় জীবনানন্দ যখন চাকরি খুঁজছেন তখন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন গোপালচন্দ্র রায়। এই মানুষটির প্রতি আমরাও যেন কৃতজ্ঞ থাকি। গোপালচন্দ্র রায় প্রথমে খড়গপুর কলেজে জীবনানন্দের চাকরি ঠিক করে দিলেন। কিন্তু রাজি হয়েও গেলেন না জীবনানন্দ। কলকাতার বাইরে তিনি যাবেন না। তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে গোপালচন্দ্র রায়ই আবার নিজে থেকে, নিজের পরিচিততরজনের পরিবর্তে জীবনানন্দের জন্যই চেষ্টা করেন যাতে হাওড়া গার্লস কলেজে তাঁর চাকরি হয়। জীবনানন্দের প্রয়োজনকে, একজন কবির বিপন্নতাকে অনেক বেশি মূল্য দিয়েছিলেন গোপালচন্দ্র রায়। অথচ তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দের এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাঁর কথা লিখেছেন সুরঞ্জন প্রামাণিক।

কলকাতায় তরুণতর ভক্তদের প্রসঙ্গেও কিছুটা বিস্তারিত হয়েছেন লেখক। ভূমেন্দ্র, স্নেহাকর, জগদিন্দ্রের সঙ্গে সুরজিৎ দাশগুপ্তের নামও এসেছে। তুলনায় মৃত্যুদৃশ্যটিকে প্রায় অ-বর্ণিত রেখেছেন সুরঞ্জন প্রামাণিক।

সুরঞ্জন প্রামাণিকের কথনভঙ্গি ও জীবনানন্দ-ভাবনার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তাঁর ভাষাতেই তুলে দেওয়া গেল।

১. কুসুমকুমারী বললেন, 'প্রতিহননের পথে মহৎ কিছু হয় না।' আনন্দ কেমন প্রাজ্ঞের মতো বললো, 'জানি।' মুহূর্ত-কয়েক নীরব থেকে বললো, 'কিন্তু মা, হনন যার টিকে থাকার প্রধান উপায়, তার হৃদয় তুমি বদলাবে কীরূপে?' যে আশঙ্কায় কুসুমকুমারীর বুক কেঁপে উঠেছিল সেই আশঙ্কা আরও গাঢ়। এবং তিনি অসহায় — ওই প্রশ্নের কোনো উত্তর তাঁর জানা নেই। এবার তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কি রাজনীতি করার কথা ভাবছিস?'
— 'তুমি কি চাও আমি স্বাধীনতা-হীনতায় বাঁচি?'
আনন্দর এই মুখর রূপ এর আগে দেখেননি কুসুমকুমারী। তাঁর কবিতা 'আদর্শ ছেলে'র একটা রূপ তিনি মিলুর মধ্যে দেখেছেন, কম কথা বলা মিলু একদিন নিশ্চয় কাজে বড় হবে — এ আশা তিনি পোষণ করেন; ওই আশার সঙ্গে মিলুর 'জেগে ওঠা'র কোনো বিরোধ নেই — এরকমই মনে হল তাঁর। বললেন, 'জয় সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় নেই — স্বরাজের দাবি জোরদার হয়ে উঠছে —'
কিন্তু পরক্ষণেই কুসুমকুমারী গম্ভীর। বললেন, 'দেশের কথা ভাবতে আমি নিষেধ করিনে, সেই সঙ্গে সংসারের কথাটাও মনে রেখো জিনিসপত্রের দাম যা বাড়ছে! তোমার বাবার একার আয়ে সংসার চালানো খুব মুশকিল হয়ে পড়েছে পড়াশুনোটা মন দিয়ে করার দরকার আছে।
২. 'পূর্ব্বাশা' থেকে বেরিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুয়ের দিকে হাঁটছিল আনন্দ। মাথার মধ্যে

একটা প্রশ্ন। উত্তর খুঁজছে। প্রশ্নটা ঢুকিয়ে দিয়েছে সঞ্জয়। সঞ্জয় মাঝেমধ্যে এমন-সব কথা বলে, কখনও রাগ কখনও বিষাদ জেগে ওঠে। আজকে সেসব কিছু নয়। আনন্দ যখন এসেছিল তখন সঞ্জয় কাজে ব্যস্ত। ব্যস্ত থাকবে জেনেও সে এসেছিল। চুপচাপ বসেছিল। তারপর এবছরের শারদ সংখ্যা 'পরিচয়' উল্টেপাল্টে দেখছিল। একসময় বিষ্ণু দে'র লেখাটার ওপর চোখ বুলাতে-বুলাতে আনন্দ ভাবছিল — সাহিত্যে ভাববাদ আর মার্ক্সবাদ কীভাবে প্রতিফলিত হয়। কিংবা ইজম অনুসারী শিল্পবস্তুটি আসলে কীরকম। বিষ্ণু তো ঠিকই লিখেছে — রুশ সাহিত্য স্ট্যাণ্ডার্ড ধরে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যকে বিচার করলে শুধু ভুলই নয়, অন্যায় হবে —

৩. আর তখনই তার মনে পড়ল সে কোনো এক আর্ট গ্যালারিতে ছবি দেখছিল — এক-একটা ফ্রেমে আটকানো টুকরো টুকরো প্রকৃতি; হিজল শিরীষ নক্ষত্র কাশ হাওয়ার প্রান্তর; অবিরল সুপারির সারি আর চাঁদ; শান্ত নদীতে ভাসছে ভেলা, দুপাশে ধানক্ষেত সবুজ সন্ধ্যার মায়াবী নরম নীল ছড়ানো সমস্ত চরাচরে; সোনালি ধানের ক্ষেত — একটি কাকতাড়ুয়া; সন্ধ্যার রাঙা মেঘ, মেঘ ছিঁড়ে সন্ধ্যাতারা — তারপর একটা কালো ক্যানভাসের সামনে — কালোর মধ্যে একটিমাত্র আলোর বিন্দু, যেন উড়ছে; আর তখন, আনন্দ স্পষ্ট মনে করতে পারল — অসংখ্য জোনাকি ফ্রেমের মধ্যে জ্বলছিল নিভছিল — সেই জ্বলা-নেভা দেখতে দেখতে সে যেন গভীর ঘুমে ডুবে গেছিল, — এই জেগে উঠল।

কিছুদিন আগে আনন্দ নন্দলাল বসুর একক প্রদর্শনী দেখেছিল, সেখানে সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা — সঙ্গে তার সুবোধ ছিল, কথায়-কথায় পাশ্চাত্য শিল্পীদের কথা উঠল, তখন একজন বলেছিল, 'ভ্যান গখের কথা ভাবাই যায় না — মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের জীবন, অথচ পৃথিবীর যাবতীয় রঙ বদলে দিয়েছেন তিনি।' আর একজন বলেছিল, 'বস্তুবাদী চেতনায় এক বিরাট আঘাতের নাম ভ্যান গখ।'

— 'কী ব্যাপার ভূমেন, এই ভরদুপুরে? তোমার দিদি আসছে নাকি?'

— 'কই, না তো!'

স্নেহাকর বলল, 'আমরা কবিতা নিতে এসেছি।'

— 'বলেছিলাম বুঝি আজ দেব!'

ভূমেন বলল, 'না। অনেকদিন আগে — তা প্রায় একবছর হতে চলল, আপনার কবিতা আমরা পাব — এই মর্মে আপনি কথা দিয়েছিলেন।'

আনন্দ অসহায়ভাবে বললো, 'একটিও কবিতা লিখিনি।'

— 'এই তো কদিন আগে শতভিষা-কে কবিতা দিয়েছেন।'

— 'বছর-দুই আগেকার লেখা —'

— 'অপ্রকাশিত তো?' বলল স্নেহাকর।

— 'হ্যাঁ, কোথাও প্রকাশের জন্য এর আগে দিইনি।'

— 'তাহলে আপনি আমাদের পুরনো কবিতাই দিন, 'আট বছর আগের একদিন'-এর সমসাময়িক কোনো কবিতা যদি থাকে ভালো হয়।'

আনন্দ একটু যেন বিস্মিত, স্নেহাকরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ও-ধরনের লেখা — এখন তো বেশ নিন্দিত, তোমরা পছন্দ করছ কেন?'

— 'আমাদের কেউ-কেউ মৃত্যুর কাছাকাছি বাস করছি।'

— 'সে কী! কেন?' দুজনেরই মুখের দিকে তাকাল আনন্দ।

ভূমেন বলল, 'কারও টিবি হয়েছে, কারও হবো-হবো।'

— 'তুমি তো ডাক্তারি পড়ছো — ওদের নিরাময় করবার কথা ভাবছ না!'

— 'আপনার কবিতাই আমাদের জীবন বিষয়ে বেশি মনোযোগী করে তুলছে।'

আনন্দ একটু সময় অন্যমনস্ক থেকে বলল, 'কিন্তু সে-সময়কার লেখা কোথায় পাব!' এখন তো ওরকম লেখা আর লিখতে পারব না!' তখনও কী যেন ভাবছিল আনন্দ, বলল, 'দিন-তিনেক পরে এসো, লেখা তৈরি করে রাখব।'

ভূমেনরা চলে যেতেই আনন্দ ভাবল, এ কী বলে গেল ওরা — জীবনবিমুখ কবির কবিতা জীবন বিষয়ে বেশি মনোযোগী করে তুলছে!

৫. জীবনানন্দের মৃত্যু-মুহূর্তটির বিবরণ সুরঞ্জন প্রামাণিকের ভাষায় নিরুত্তেজ কিন্তু ভাব-গভীর —

— এই তো আমি

— এ কোথায় এলাম আমরা?

— সবুজ নদীর দেশে —

আনন্দর চোখের সামনে ভাসছে নরম নীল সন্ধ্যার নদী, দিগন্তে টিপের মতো পূর্ণিমার চাঁদ আমি এই নদীটির কিনারে শুয়ে থাকব —

আনন্দ হাঁটছে নদীর দিকে ...

দূর থেকে ভেসে আসছে জেলেনৌকার ঠক্ ঠক্ — কেমন সুরেলা অচেনা আওয়াজ ...

কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে আনন্দ ...

নদী না ফসলের ক্ষেত? ওই তো সবুজ বাতাস বয়ে আসছে; নদীর বুক থেকেই কি উঠে আসছে অমন শরীর জুড়ানো হাওয়া? প্রবল হাওয়া! টাল সামলাতে পারছে না আনন্দ — আর নৌকাটাও তাকে আল্‌তো ছুঁয়ে গেল — নক্ষত্র-সমেত সমস্ত আকাশটা নেমে আসছে; যেন বালক মিলুর পতন রুখে দিতে ছুটে আসছেন নক্ষত্র-হয়ে-যাওয়া সত্যানন্দ-কুসুমকুমারী ...

নিভে যাচ্ছে তারার আকাশ ... একটা কালো ক্যান্‌ভাস আনন্দর চোখের সামনে, ক্যান্‌ভাস জুড়ে অন্ধকারের আবর্ত ... একটা সুড়ঙ্গ টেনে নিচ্ছে তাকে ...

এরপর ঔপন্যাসিক তুলে দিয়েছেন জীবনানন্দের মৃত্যুর পর প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত আপনীগুলি। সেইসময়ে সেটুকুই প্রাপ্য হয়েছিল তাঁর।

কেতকী কুশারী ডাইসন-এর বই *তিসিডোর* একটি উপন্যাস — কিছুটা আত্মজৈবনিক। তার চেয়ে বলা ভালো তাঁর দীর্ঘ বিদেশবাসের একটি কালখণ্ডের অভিজ্ঞতার লিখিত রূপ। আত্মস্মৃতিও বলা যায় লেখাটিকে। তবে স্মৃতির সঙ্গে নিজের ভাবনা কিছু কিছু মিশেছে বলে উপন্যাসও বলা যায়।

উপন্যাসের এক অংশে তাঁর নিজের (নাম তিসি) অভিজ্ঞতার বিবরণ, আর একটি অংশে এক বিদেশিনী বান্ধবীর জীবন-কথা, অপর একটি অংশের অবলম্বন আর একটি বই। জীবনানন্দের রচিত, ১৯৩২-এ লেখা কিন্তু জীবৎকালে অপ্রকাশিত *সফলতা নিষ্ফলতা* নামের উপন্যাস। নামটি সম্পাদকের প্রদত্ত। যেমন জীবনানন্দের বহু উপন্যাসের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কারণ লেখক নামকরণ করেননি। সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহ উপন্যাসটির বিভিন্ন প্রসঙ্গের বিস্তৃত টীকা দিয়েছেন। কেতকীর বলবার কথাটি অবশ্য ভূমেন্দ্র গুহ-র টীকা নিয়ে ততটা নয়; যতটা তাঁর ভূমিকায় কথিত সিদ্ধান্ত নিয়ে।

উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র নিখিল এবং বাণেশ্বর। নিখিলকে সম্পাদক মনে করেছেন লেখক স্বয়ং এবং বাণেশ্বরের চরিত্রে একাধিক ব্যক্তির মিশ্রণ থাকলেও প্রধানত তিনি বুদ্ধদেব বসু। ভূমেন্দ্র গুহ-র অনুমান যে ভুল নয় তা যেকোনো পাঠক উপন্যাসটি পড়লেই বুঝবেন। তবে কোথাও কোথাও ভূমেন্দ্র গুহ ব্যক্তি বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনা উপন্যাসের নিখিলের উপর চাপিয়েছেন; এবং বিপরীতক্রমে উপন্যাসের নিখিলের ভাবনা ও কাজ ব্যক্তি বুদ্ধদেবের বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানেই কেতকী কুশারী ডাইসন-এর আপত্তি। কেতকী এই উপন্যাসের পাঠ-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। পড়তে খুবই ভালো লাগে। কেতকীর মতে বাণেশ্বরকে উপন্যাসের চরিত্র রূপে গ্রহণ করবার পরিবর্তে ব্যক্তি বুদ্ধদেব রূপে গ্রহণ করতেই ভূমেন্দ্র গুহ বেশি উৎসাহী। জীবনানন্দকে নিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক উপন্যাস লিখেছেন জীবনানন্দ নিজেই। *সফলতা নিষ্ফলতা* উপন্যাসও তাই। কেতকী কুশারী ডাইসন-এর একটি অভিযোগ উপন্যাসটিকে ঘিরে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। অভিযোগের লক্ষ্য জীবনানন্দ স্বয়ং। বাণেশ্বর চরিত্রটিকে বিভিন্নভাবে কিছুটা ব্যঙ্গ, কিছুটা তির্যক কটাক্ষের লক্ষ্য করে তোলা হয়েছে উপন্যাসে। বাণেশ্বরের প্রতি নিখিলের ঈর্ষা বেশ প্রকট। বাণেশ্বর সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত, নিখিল ততটা নয়। বিভিন্নভাবে বাণেশ্বরের আত্মম্ভরিতা, রুচি চতুরতা ইত্যাদিকে বিদ্ধ করেছে নিখিল — মনে মনে। কেতকী কুশারী ডাইসন বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসুকে অল্পবয়স থেকেই চেনেন। বুদ্ধদেব বসুকে বাণেশ্বর বলে ধরে নিলে এই উপন্যাসে বুদ্ধদেবকে যথেষ্ট ছোটো করা হয়। কেতকী কুশারী-র তা ভালো লাগেনি, সংগতও মনে হয়নি। কিন্তু ধরে না নিয়েও উপায় নেই। সাদৃশ্য এতটাই। এখানেই কেতকী কুশারীর আরও অভিযোগ — তাঁর মতে বুদ্ধদেব বসুর প্রতি জীবনানন্দের ঈর্ষারই অভিব্যক্তি এই উপন্যাস।

বর্তমান নিবন্ধের অবলম্বন জীবনানন্দকে নায়কের ভূমিকায় রেখে লিখিত দুজন লেখকের দুটি উপন্যাস। কেতকী কুশারীর লেখাটি বা জীবনানন্দের উপন্যাসটি এই আলোচনার আওতায় আসে না। কিন্তু জীবনানন্দের বইয়ের প্রধান দুই চরিত্র জীবনানন্দ (এখানে নিখিল) এবং বুদ্ধদেব বসু (অনেকটাই বাণেশ্বর) সম্পর্কে কেতকীর বিশ্লেষণ পাঠকের কাছে আকর্ষক মনে হবে। কেতকীর

উপন্যাসেও যেন কিছুটা পাওয়া যায় জীবনানন্দকে — যদিও তা নায়কের ভূমিকায় নয়। নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে এখানে দেখা হয়েছে জীবনানন্দের চরিত্রটিকে। বুদ্ধদেব বসুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতই নিখিলের বাণেশ্বরকে ছোটো করবার প্রবণতাটিকে সমালোচনা করেছেন কেতকী। যথেষ্ট যুক্তিসাপেক্ষ কেতকীর বিশ্লেষণ। এমন তো নয় যে, সবদিক থেকেই অত্যন্ত মহানুভব এবং আদর্শ এক মানুষ ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। বিরাগ ও ঈর্ষা তাঁর মনের মধ্যে থাকতেই পারে। সেই মনোভাব লেখায় অভিব্যক্ত হতেও পারে।

কিন্তু তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য মানুষ। অপরিমেয় প্রতিভাবান ভাষা-শিল্পী এবং নিঃসীম গভীর মনের এক সাহিত্য-স্রষ্টা। সেই মনের নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সেই প্রতিভার সৃষ্টিকে আয়ত্ত করাও অতীব দুরূহ। তাই জীবনানন্দের পাঠকসংখ্যা আজও বেশি নয়। সেজন্যই জীবনানন্দ ধীর গতিতে হলেও কালান্তরের অমোঘ ইঙ্গিতে রাবীন্দ্রিক কাব্যাদর্শের উত্তরকালে নবীন কবিতার মনন, উপলব্ধি এবং ভাষণ-কলার এক স্মরণীয় স্রষ্টা হয়ে থাকেন। এজন্যই তাঁকে নিয়ে লেখা হল দু-দুটি জীবনী-উপন্যাস। একুশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা গবেষণা-ক্ষেত্রের উল্লেখ্য ঘটনা এটি। জীবনী-উপন্যাস একইসঙ্গে সাহিত্য ও গবেষণা। জীবনী উপন্যাসের এই শ্রমসাধ্য পাঠ আমাদের অভ্যস্ত হয়ে উঠবে আশা করি।